রবীন্দ্ররাজনীতি

সৈয়দ আবুল মকসুদ

রবীন্দ্ররাজনীতি

সৈয়দ আবুল মকসুদ

মুক্তধারা

মুক্তধারা ২১২০

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
২২, প্যারিদাস রোড, ঢাকা- ১১০০

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯১/পৌষ ১৩৯৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০২, নভেম্বর ১৯৯৫
তৃতীয় প্রকাশ : মাঘ ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী : আককাস খান

মুদ্রণ : আল্-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেইন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

RABINDRARAJNEETI
[Politics of Rabindranath]
By Syed Abul Maksud
Third Edition : February 2007
Cover Design : Akkas Khan
Publisher : C.R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
22 Pyaridas Road, Dhaka- 1100
Bangladesh
Price : Taka 50.00
ISBN : 984-13-1691-9

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৬-এর ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা' শীর্ষক সেই সেমিনারে এ লেখাটি পঠিত হয়েছিলে। তার পর ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য পত্র'র ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় 'রবীন্দ্ররাজনীতি' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সময় লেখাটি কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৯৬১-তে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের পরে ১৯৮৬-তে এসেছিলো আমাদের জীবনে আর একটি সুযোগ কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের। ঐ উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর নতুন করে আলো ফেলা যেতো, বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর চিন্তাচেতনা ও শিল্পকর্ম আরো বেশি করে পৌঁছে দেয়ার আয়োজন হতে পারতো। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বার্থেই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক চর্চা প্রয়োজন। ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলাদেশে কিছু আলোচনাসভা, বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু উপলক্ষটি যে-মাত্রা ও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিলো নানা কারণে তা পায়নি। পরিমাণগত দিক থেকে তা ছিলো সংখ্যায় অল্প, প্রকৃতিগত বিচারে তা প্রথাগত, অনেকখানি যেন দায়ে পড়ে করার মতো। তিনি কবি আমাদের অথচ লক্ষ্য করেছি, বিশ্ববাসী তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আয়োজনে কোনোই কার্পণ্য করেনি।

ভারতে ছিয়াশি হয়ে উঠেছিলো রবীন্দ্র-বছর। সংখ্যাহীন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে নানা জায়গায় বছরব্যাপী। তা ছাড়া লক্ষ্য করেছ, সে-সময় অস্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকা, কানাডা-জাপান-কোরিয়া থেকে চীন-ভিয়েতনাম-সোভিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম ইউরোপ থেকে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হয়েছে। ১৯৮৬-এর ১৫ মে হ্যানয় নগরীতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও কবিতার ওপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটি বিদেশী বেতার কেন্দ্র থেকে সে-সম্মেলনের বিবরণ শুনি। ১৭ জুন টেগোর সোসাইটি অব কোরিয়া এবং ইন্ডিয়ান উইমেন্‌স এসোশিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে সেউল-এ 'চিত্রাঙ্গদা' পরিবেশিত হয়। খ্যাতনামা দক্ষিণ কোরীয় লেখক কিম ইয়াং শিক 'চিত্রাঙ্গদা' কোরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ইনটারন্যাশনাল কালচারাল সোসাইটি অব কোরিয়া প্রযোজিত সে-অনুষ্ঠানের বিবরণ এক বন্ধুর চিঠিতে জানতে পারি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পঠিত ও আলোচিত। ১৯৮৬-এর ১৮ মে রোববারের ছুটির দিনটি ছিল মস্কোর সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের জন্য এক অত্যন্ত

আনন্দের দিন। এ দিন মস্কোর সোকোলনিকি পার্কে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য রবীন্দ্র-উৎসব। সেটির উদ্যোক্তা ছিলো মস্কোর জেলা কমিউনিস্ট পার্টি। রুশ বালক-বালিকাগণ পরিবেশন করে কবির নৃত্যনাট্য, সংগীত প্রভৃতি। সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে আবৃত্তি করেন মিখাইল কুরগান্টসিয়েভ।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির ওপর বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয় জুন মাসে। বেইজিং থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে চীনেও রবীন্দ্র সাহিত্য-শিল্পের ওপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান রয়েছে। জার্মানির কয়েকটি শহরেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ ও চিন্তাবিদ নন, তিনি এ শতকের একজন শীর্ষস্থানীয় চিত্রশিল্পী তা তাঁর ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীতে বিশ্ববাসী আর একবার স্বীকার করলো। ব্রিটেনে বার্কিংহাম গ্যালারি, মানচেস্টার কর্নার হোম, গ্লাসগোর থার্ড আইন গ্যালারি, বেডফোর্ড-এর কোর্ট হোয়াইট হল এবং অক্সফোর্ডের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট প্রভৃতির রবীন্দ্রনাথের আঁকা আড়াই হাজার ছবি থেকে বাছাই করে ৮৮টি দুর্লভ ছবি প্রদর্শিত হয় এক বছর ধরে। মস্কোতেও অনুরূপ চিত্রপ্রদর্শনী হয়। সে-ছবিগুলো রাশিয়া সফরের সময় সেখানকার বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দিয়েছিলেন কবি। বিবিসির বাংলা বিভাগ ১৯৮৬-এর জুলাইতে এক মনোজ্ঞ সংগীতসন্ধ্যার আয়োজন করে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীগণ সেখানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

এ যাবৎ অজস্র লেখালেখি হলেও রবীন্দ্রজীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে গবেষণার অনেকটাই অবশিষ্ট রয়েছে। সে-উদ্দেশ্যেই ১৯৮৬-তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এক স্থায়ী 'রবীন্দ্র গবেষণা সেল' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়। উপাচার্য ড. নিমাই সাধনবসু বলেছিলেন, কবির ১২০০০ চিঠিপত্রের ভিত্তিতে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এই সামান্য পুস্তিকার প্রকাশ-মুহূর্তে আমার বারবার মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্য লজ্জাজনক।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আগ্রহ প্রকাশ না করলে এ লেখা হয়তো এখন বই আকারে বের হতো না। অতুলনীয় তাঁর আন্তরিকতা। উৎসাহ পাওয়া গেছে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের সমন্বয়ক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক জনাব আহমদ রফিকের কাছ থেকে। শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা বইটি প্রকাশ করে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

ঢাকা — সৈয়দ আবুল মকসুদ

২৩, ১০, ১৯৯০

ব্যাপ্ত হলে যা, অন্ধকার, সংহত হলে তা আলোক; আরও সংহত হলে তা অগ্নি।
সংহতিই প্রাণ। সংহত হলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।

বিচিত্র প্রবন্ধ

Our real problem in India is not political. It is social.

Nationalism

সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত অন্যান্য গ্রন্থ

যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা
হরিশচন্দ্র মিত্র
জার্মানীর জর্নাল (তৃতীয় সংস্করণ)
গোবিন্দচন্দ্র দাস
গোবিন্দচন্দ্র দাসের ঘর-গেরস্থালি
ভাসানী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য [দুই খণ্ড]
বিকেলবেলা
দারা শিকোহ্ ও অন্যান্য কবিতা
ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র

রবীন্দ্ররাজনীতি

এক

যে-কোনো সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও মননশীল ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে দু'ভাবে : তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর যে-কর্মকাণ্ড তার ভেতরে। যেমন, একজন কবি বা ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পুরোপুরি প্রতিফলন শুধু যে তাঁর কবিতা বা উপন্যাসেই ঘটবে তা নয়, তাঁর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সামগ্রিক পরিচয়ের জন্যেও দুটি সূত্র থেকে অনুসন্ধান করতে হবে : একটি তাঁর সৃষ্টি, অপরটি তাঁর অন্যান্য কর্ম। চিন্তাধারা যদি কর্মে বাস্তবরূপ লাভ না করে তবে তার মূল্য অর্ধেক; অপর দিকে একজন প্রচার করেন এক কথা, নিজে করেন অন্য জিনিস সে-ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ চারিত্র চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ধরা যায়, একজন কথাশিল্পী এমন এক কাহিনী লিখলেন যেখানে প্রধান চরিত্র বিপ্লবী-বিদ্রোহী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কিন্ত ব্যক্তিগত জীবনে লেখক নিজে সুবিধাবাদী, সমাজের শত্রুদের সঙ্গে একাসনে তাঁর অবস্থান এবং প্রগতিবিরোধী, তা হলে কি তাঁকে আমরা মহৎ ব্যক্তি বলবো?

মানুষ যে-পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করে, যে-পরিবারে সে পরিবর্ধিত ও প্রতিপালিত হয়, যে-আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ওঠাবসা করে, যে-সমাজের বাসিন্দা অর্থাৎ সর্বোপরি যে-শ্রেণীর সে সদস্য তার সার্বিক চরিত্র ও তাদের দুর্বলতা, দোষ ও গুণাবলী, তার মধ্যে সংক্রামিত ও সংযোজিত হতে বাধ্য। তার পরেও প্রতিভাবান পুরুষ তাঁর পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেটি শুধু বঙ্গের নয় উমহাদেশের রাজনীতিসচেতন ও সংস্কৃতিবান পরিবারগুলোর অন্যতম। সরকারের বিরোধিতার মধ্যেই শুধু রাজনীতি নেই– যারা সচেতনভাবে সরকারকে সহযোগিতা ও তোয়াজ করে তারাও রাজ-নীতি-সচেতন। নীলমণি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে যেদিন দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো পুরুষের আবির্ভাব ঘটে সেদিনেই কুসংস্কারের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলায় একটি নতুন সূর্যের উদয় হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে দ্বারকানাথ শুধু যে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন তাই নয় রাজ-নীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তিনি হয়ে ওঠেন দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। উনিশ শতকের শুরু থেকেই ঠাকুর-পরিবার বাংলার প্রধান রাজনীতিসচেতন পরিবারগুলোর একটি। সে-শতাব্দীর সর্বোচ্চ গুণ ও দোষ

এই পরিবারে প্রবেশ করেছিলো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ দেশের রাজনীতিতে ঠাকুর-পরিবার সক্রিয় ভূমিকা রাখার মতো অবস্থান গ্রহণ করে। দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' উপাধি অকারণে পাননি। ইংরেজদের তিনি সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। সেই যোগ্যতা যাঁর আছে তিনি এবং তাঁর অধস্তন পুরুষরা রাজনীতির প্রতি কখনোই বীতস্পৃহ থাকতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। ... আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছু প্রয়োজন ছিলো না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল।"

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ এই সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। উনিশ শতকের ৮০-র দশকে কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' সংগীতটি পরিবেশন করেন। ১৮৯৩-৯৪ সালে ৩২ বছর বয়সে এক রাজনৈতিক-সামাজিক সম্মেলনে, যার সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ১৮৯৫-৯৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী শিল্পোদ্যোগে সাড়া দিয়ে তাঁদের সাহায্যে নানা কর্মকাণ্ডে কবিকে নিয়োজিত থাকতে দেখা য়ায়। এই সময়ই 'অয়ি ভুবনমনোমোহনী' জাতীয় সংগীতটি রচনা করেন।

গত শতকের শেষ দশকটিতে রবীন্দ্রনাথ নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। ১৮৯৭-তে নাটোরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। পরের বছর Sedition Act-এর প্রতিবাদে কলকাতা টাউন-হলে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সভায় 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'কণ্ঠস্বর' প্রসঙ্গে পরে আসছি।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি তাঁর সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি' শীর্ষক রচনায় ঠিকই বলেছেন, "রাজনীতি আলোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দারিদ্র্যের, আমাদের বিড়ম্বনার জন্য আমাদের সমাজের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, তার অন্যায়কেই প্রধানত দায়ী করেছেন। তাঁর কল্পিত রাষ্ট্র সমাজেরই বিকাশ।"[১] অর্থাৎ সমাজসেবাকে তিনি রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখেননি। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারী

দেখা দিলে সে-সময় ভগিনী নিবেদিতা ও অন্যান্য সমাজকর্মীর সঙ্গে কবিও সেবাকাজে সহাযোগিতা করেন।

শচীন সেনের Political Philosophy of Rabindranath (১৯২৯) গ্রন্থ পড়ে কবি লিখেছিলেন, "..... অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্র-নীতির মতো বিষয়ে কোনো বাধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি— জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।"[২] রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি নিয়ে লেখালেখির সূচনা হয়েছিলো তাঁর জীবদ্দশায়ই, ধীরে ধীরে তা পরিমাণে বিপুল হয়ে ওঠে। এ বিষয়ের সকল লেখকই চেয়েছেন তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবি চেয়েছেন তাঁকে 'অংশে অংশে বিচার' না করে 'সমগ্রভবে অনুভব' করতে। সেই সমগ্রভাবে অনুভব করা কঠিন কর্ম, কারণ কবির কর্মজীবন যেমন দীর্ঘ তেমনি তাঁর কাজের পরিমাণও বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ক্ষুদ্র রচনায় রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি আলোচনা করতে গেলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা কঠিন।

১৯০৪ সালে কবি টাউন হলে 'শিবাজী-উৎসব' পাঠ করেন এবং লেখেন প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ'। পরের বছর ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অন্যান্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে তিনি অসামান্য উদ্দীপনাসহ অংশগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি দেশপ্রেমমূলক বহু সংগীত রচনা করেন যা তাঁর স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতিসচেতনতার পরিচয় ধরে রেখেছে। 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশ' প্রভৃতি এই সময়ই রচিত। তা ছাড়া এই সময় নানা জায়গায় রাজনৈতিক-সামাজিক সমাবেশ-সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা করেন। দেশপ্রেম ও রাজনীতি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ সমাজসেবা ও রাজনীতিতে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকায় তাঁর রাজনীতিবিষয়ক রচনা যেমন 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'পথ ও পাথেয়', 'রাজাপ্রজা', 'সমাজ,' 'শিক্ষা' প্রভৃতি রচিত হয়। কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। ১৯১১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি পরিবেশন করেন "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, আমি তাঁর রাজনীতিতে জড়িত থাকার ঘটনাগুলোর ওপর যতো জোর দিচ্ছি ততোটাই দূরে থাকতে চাইছি তাঁর রাজনীতির চারিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ ও তার পক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য করা থেকে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকটি কবির জন্য বিশেষভাবে সৃষ্টিশীল সময় : তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। এই সময় তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯১৭ সালে জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা ধ্বনিত হয় কবির কণ্ঠে। 'জাতীয়তা'

বিষয়ে আমেরিকায় বক্তৃতা দেন। বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখেন 'ছোটো ও বড়ো'। স্যাডলার কমিশন ও ভারত-সচিব মন্টেগুর সঙ্গে তিনি দেখা করে দেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯১৯ সালের ৩০শে মে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, কয়েক সপ্তাহ পরে হলেও, তিনি 'নাইট' খেতাব ত্যাগ করেন।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীনে যান, পরে জাপানও সফর করেন। ১৯২৬ সালে কবি ইতালি সফর করেন মুসোলিনির আমন্ত্রণে। ইতালিতে আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন এবং মুসোলিনির প্রশংসা করেন। এখানে মনে রাখা দরকার, সেকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মতো উন্নত ছিলো না, রেডিও-টেলিভিশন তো নয়ই পত্র-পত্রিকা ও ডাকযোগাযোগ সে-সময় ছিলো অনগ্রসর। বিমান-যোগাযোগের সেটি সূচনাকাল। তাই এক দেশের খবর অন্য দেশে পৌঁছতো বেশ দেরিতে। ইউরোপের কোথায় কোন্ দেশে কী ঘটছে, কোথায় কে স্বৈরাচারী একনায়করূপে উত্থিত হচ্ছে, সে-খবর সবচেয়ে বিচক্ষণ বাঙালির পক্ষে রাখাও কঠিন ছিলো। অবশ্য মুসোলিনির প্রশস্তি প্রকাশের পরই, ফ্যাসিবাদীদের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে, 'ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ চিঠি লিখে কবি ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদ করেন।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সফরে যান। সেখানে সমাজতান্ত্রিক সরকারের কর্মসূচি দেখে মুগ্ধ হন, যা তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে বর্ণিত হয়েছে। রাজনীতির প্রভাব মানবজীবনের ওপর কতটা প্রবল সে-সম্পর্কে তাঁর নতুন করে ধারণা হয়। খেটে-খাওয়া মানুষের—কৃষকের ও শ্রমিকের— জীবনের দিকে তাকাবার প্রয়োজনীয়তা তাঁর উপলব্ধ হয়। তাই তাঁকে বলতে দেখা যায়, "বহুকাল থেকেই আশা করেছিলম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রাস্টির মত থাকি।" যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীর বৃত্তের বাইরে আসবার সুযোগ পাননি।

রবীন্দ্রনাথের স্বভাব সম্পূর্ণরূপেই একজন মহান সংস্কারকের — বিপ্লবীর নয়, সুতরাং তাঁর রাজনীতিতে একজন সমাজসংস্কারকের পরিচয়ই পাওয়া যাবে। প্রগতিশীল তিনি, অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু তার চেয়ে বেশি যেন উদার-রক্ষণশীল। তিনি সমাজের ভাঙা জায়গাগুলো মেরামত করার যতোটা পক্ষে ছিলেন ততেটা আমূল পরিবর্তনের নয়। এ জন্যে উগ্র অর্থাৎ বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। তাঁর রাজনীতিপ্রধান উপন্যাসগুলোয় সে-পরিচয় পাওয়া যাবে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বক্তব্য'-গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি' শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেন, "১৯০৫ সালের পর থেকে দেশে extremism শুরু হয়, তার এক মুখ ছিল ধ্বংসের দিকে, অন্য মুখ গোঁড়ামির দিকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ কোনোটাই তার সমাজধর্মের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেন আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে, 'গোড়া', 'ঘরে বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত বিস্তর রচনায় তার প্রমাণ পাবেন। যেটার প্রমাণ সহজে মিলবে না সেটা তাঁর কর্মের। কিন্তু যাঁরা তাঁর কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, শান্তিনিকেতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায় সমিতি পাঠশালা, হাসপাতাল খোলা, পুকুর কাটানো, গাছ লাগানো, পল্লী-সংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, National Council of Education-এ যোগদান— তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল।"

তিনি আরো লিখেছেন, " রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক—অধিকারসর্বস্ব নয়, ত্যাগধর্মী।"

এ ধরনের বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির ধরনের প্রতি এক ধরনের সমর্থনই প্রকাশ পায়; অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির কঠোর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচকের সংখ্যাও স্বল্প নয়। সে-সবই বিচারকের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ঘটেছে। তবে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দখলদার জাতি ইংরেজদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বরাবরই ছিলো স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি সদয় ও নমনীয়। নোবেল পুরস্কার পাবার পর তিনি যে বিশাল জনপ্রিয় পুরুষে পরিণত হন তাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি আরো কঠোর ও অনমনীয় হতে পারতেন। তাতে শাসকশ্রেণী অর্থাৎ ইংরেজরা তাঁকে বিশেষ প্রত্যাঘাত করতে সাহস পেতো না। বিশের দশকে যখন স্বরাজের প্রশ্নে দেশবাসী উচ্ছ্বসিত, যুবসমাজ শুধু নয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন সংঘবদ্ধ হয়েছে, ফাঁসির দড়ি হাসতে হাসতে গলায় পরছেন স্বাধীনতাকামী মানুষ, তখনো রবীন্দ্রনাথের সুর নরোম, বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্দে, ঋষিসুলভ শান্ত। ইংরেজের তিনি সমালোচনা করেননি তা নয়, ঘৃণা ও আক্রোশও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহু রচনা ও বক্তৃতায়, কিন্তু তাতে জোর কম। তাতে আক্রমণের তেজ নয়, বরং বেজে উঠেছে প্রায়শই বেদনার সুর।

রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদের একটি প্রতিপক্ষ থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে এ দেশের মানুষের রাজনীতির প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলো ইংরেজ শাসকরা। সুতরাং কোনো রাজনীতিসচেতন ব্যক্তির সেই প্রতিপক্ষের প্রতি মনোভাব কেমনতর সেটা বিশেষভাবে বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ে, এই শতকের ৩০-এর

দশকে যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম উত্তাল আকার ধারণ করেছে, সেই সময়, শ্রাবণ ১৩৪০-এ রচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধে তাঁকে বলতে দেখা যায় :

"তারপরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষ রূপে নয়, নব্যয়ুরোপের চিত্ত প্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে।...

"ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।"

এই বক্তব্যে রয়েছে পরিষ্কার কৃতজ্ঞতাবোধ এবং প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজের প্রতি মুগ্ধতা। আবার এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র লক্ষ্য করা যাবে আক্ষেপ, কিছুটা যেন অভিমান ও হতাশা

"অনেক দিন আশা করেছিলুম, বিশ্বইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে; এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেক দিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম, চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ-শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই— অদূর ভবিষ্যতেও তার যে সম্ভাবনা আছে তাও দেখতে পাই নে—কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠ দানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।" অর্থাৎ ইংরেজভক্ত কবি ইংরেজের থেকে আশা করেছিলেন আরো বেশি, যা পেয়েছেন সেইটুকুতেই খুশি নয় তাঁর মন।

একটি দখলদার ঔপনিবেশিক শক্তি যে দখলিকৃত ও উপনিবেশিত দেশের মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হবে তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। ভারতবর্ষীয়দের দুর্বলতার সুযোগেই যে শক্তিশালী ও চতুর (মেধাবীও নিঃসন্দেহে) ইংরেজরা এদেশের ওপর চেপে বসে সেটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু সেই অন্যায় দখলকারী শক্তি উপনিবেশিত এক অনগ্রসর জাতির অগ্রগতির চাকাকে সামনের

দিকে ঠেলা দেবে তা আশা করা একজন অতি ভালোমানুষ ও ভাববাদীর পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রজীবনের প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, তিনি শুধু অতি সজ্জন ও একজন ভালোমানুষই ছিলেন না বাস্তব ও বৈষয়িক জ্ঞানও ছিলো তাঁর অতি প্রখর। এ দেশবাসীর প্রতি ইংরেজের হৃদয়হীনতা কখনো কখনো তিনি ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হলেও তাদের ভালোত্বের প্রতিও যেন তিনি ছিলেন বিশ্বাসে অবিচল। ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাবেই এটা তাঁর বুঝতে যেমন অসুবিধা হয়নি, তেমনি তারা গেলে 'দেশটা চলবে কিভাবে' এমন একটা অসহায় বোধ যেন তাঁকে শঙ্কিত করেছে। এজন্যই তিনি ইংরেজদের দোষারোপ করার চেয়ে নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের ওপরই জোর দিয়েছেন বেশি।

চিরকাল ভারতবর্ষ ভারতের অধিবাসীদের দ্বারাই শাসিত হয়নি, যুগে যুগে এদেশে বহিরাগত শক্তির বা শত্রুর আবির্ভাব ঘটেছে। আর্যরা এদেশে প্রথম বিদেশী। তারপর শক, হূণ, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি শাসকরা বাইরে থেকে এসেছে। কিন্তু তারা বাইরে থেকে এসে এখানেই থেকে গেছে। পাঠান বা মুঘলরা এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের পূর্বপুরুষদের দেশে পাচার করেনি; এদেশের সম্পদ এদেশেই ব্যয় করেছে। আর্যরাও এখানে এসে এদেশীয় হয়েই থেকে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী বিদেশী শাসক ব্রিটিশরাজ—ইংরেজরা এদেশের কেউ নয়, তাদের স্থায়ী ঠিকানা ব্রিটিশ দ্বীপুঞ্জ এবং শুধু তাই নয়, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নিপীড়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করা। সুতরাং ইংরেজরা ভারতবাসীর প্রধান ও একমাত্র শত্রু হওয়া সত্ত্বেও শব্দ প্রয়োগে অতি-সতর্ক রবীন্দ্রনাথকে যখন বলতে শুনি—

এসো হে আর্য এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরেজ
এসো এসো খৃস্টান।

[গীতাঞ্জলির ১০৬ নং কবিতা]

তখন তাঁর ইংরেজপ্রীতি আর একটুও প্রচ্ছন্ন থাকে না। আর্য, অনার্য, হিন্দু, শক, হূণ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের 'ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' এসে 'মঙ্গলঘট' ভরবার আহ্বান জানালে বলবার কিছু থাকে না, কারণ তারা অনেক আগে ভারতের জাতীয় মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে ইংরেজরা থাকবে কেন? যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গোটা জাতির। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ প্রীতির ফিরিস্তি খুবই দীর্ঘ হবে, সুতরাং ও-প্রসঙ্গে বেশি বাক্যব্যয় না করে আমাদের পরিমাপ করা উচিত এই মানবতাবাদী মনীষীর স্বদেশপ্রীতির পরিমাণ এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি যতোই নমনীয়তা প্রদর্শন করুন না কেন ব্রিটিশ সরকারের প্রীতিভাজন ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। সরকার তাঁকে ঠিকই এবং সঙ্গত কারণেই, সন্দেহের চোখে দেখতো। বাংলাদেশে যে-সব প্রভাবশালী ও খ্যাতিমান ব্যক্তি সরকারবিরোধীদের সঙ্গে সংশ্রব রাখতেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের একজন। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে সরকার গোয়েন্দা-পুলিশকে যে-বাইশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গতিবিধির ওপর নজর রাখার গোপন নির্দেশ জারি করে তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নামও ছিলো। অন্য একুশ জনের মধ্যে ছিলেন ইংরেজি দৈনিক 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, টাঙ্গাইলের জমিদার আবদুল হালিম গজনভী, বর্ধমানের জমিদার আবুল হোসেন, ব্যারিস্টার পরমেশ্বর লাল, ব্যারিস্টার এস. এন. হালদার, রাজনৈতিক কর্মী দীদার বক্‌শ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার সেন, সাংবাদিক হরিদাস হালদার, গৌরীপুর ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ। যদিও 'বাংলার গভর্নরদের সঙ্গে শান্তি নিকেতনের' (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের), অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায়, "সহৃদয় সম্পর্ক চিরকাল অব্যাহত ছিল।"

দুই

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পঁয়ষট্টি বছরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যতখানি আলোড়িত হয়ে প্রবলভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, প্রাসাদ থেকে পথের মানুষের পাশে নেমে আসেন, জীবনে আর কোনো দিন তেমনটি করেননি। ব্যাপারটি কৌতূহলউদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গ হয়েছিলো লর্ড কার্জনের শাসনকালে। ইংরেজ শাসকদের মধ্যে কার্জন মানুষ হিসেবে 'ভালো' ছিলেন বলে অনেকেই স্বীকার করেছেন। সুভাষচন্দ্রের একজন জীবনীকারের ভাষায়, "কার্জন ব্যক্তি হিসেবে যে খুব খারাপ ছিলেন তাও নয়। রেঙ্গুন ও শিয়ালকোটে বৃটিশ সৈন্যদের হাতে দু'বার দুটি ভারতীয় নারী লাঞ্ছিত হলে তিনি সৈন্যদের কঠোর শাস্তি বিধান করেছিলেন। ট্রানসভালের স্বর্ণখনির জন্য ভারতীয় মজুর নিয়োগ করতে দিতে তিনি অস্বীকৃত হন। ভারতের প্রাচীন স্মৃতিসৌধ রক্ষা আইনেরও তিনিই প্রবর্তক; কিন্তু বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি তার ছিলো ভীষণ বিদ্বেষ।"[৩] এই শিক্ষিত শ্রেণী বলতে লেখক 'শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়'কেই উল্লেখ করেছেন। যাইহোক, প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলে পূর্ববঙ্গ

ও আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িস্যা নিয়ে ভিন্ন একটি প্রদেশ গঠিত হওয়ার কথা ঘোষিত হতে না হতেই বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় উত্তেজনায় ফেটে পড়ে—যা গণআন্দোলনের আকার নেয়। অপরদিকে শিক্ষা ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনগ্রসর পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ রাজনৈতিক সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। এ. কে. মজুমদার তাঁর Advent of Independence পুস্তকে লিখেছেন,

"The Hindu nationalists were usually the cream of their society, While some of the Muslims who came out in favour of East Bengal were the scum; their leaders, Who Were decent Men, had no control over these people who committed atrocities."[৪]

যাই হোক, হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ সমাজের 'ননী' এবং পূর্ববাংলা প্রদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষের মুসলমানরা সমাজের 'বর্জ্য' বা 'আবর্জনা' বলে বর্ণিত হলেও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পেছনে রাজনীতি যতো না ছিলো তার চেয়ে বেশি ছিলো অর্থনীতি। সমাজের উচ্চশ্রেণীর—হিন্দু ভূস্বামীদের অধিকাংশের জমিদারি ছিলো পূর্ব বাংলায়। ঠাকুর-পরিবারেরও আয়ের প্রধান উৎস ছিলো পতিসর, শাহজাদপুর, শিলাইদহ প্রভৃতি এলাকার জমিদারি। পূর্ব বাংলার নব্বই শতাংশ প্রজার—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক ক্ষেতমজুর কামার কুমার জেলে তাঁতি সকল শ্রেণীর শ্রমজীবী ও পেশাজীবীর—আর্থিক অবস্থা ছিলো শোচনীয়। তার ওপর হিন্দু-মুসলমান সকল জমিদারই ছিলো অত্যাচারী। যে-ইংরেজের জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই ইংরেজ শাসকদের পূর্ববাংলার পশ্চাৎপদতার বিষয়টি দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু চতুর ইংরেজ এক ঢিলে দুই পাখি মারার উপায় উদ্ভাবন করে। বাংলা ভাগ করে পূর্ব বাংলা ও আসামের শিক্ষা-সম্পদে অনগ্রসর মুসলমানদের প্রীত করে এবং এই বিভক্তি কেন্দ্র ক'রে উদ্ভূত হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তারা উপভোগ করতে থাকে। অপরদিকে নব্বই ভাগ মানুষের ওপর শোষণ-শাসন পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। ১৯০৫ সালে জুলাই মাসে বাংলা-বিভক্তির প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগে লড কার্জন ঢাকা সফরে এসে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে এটাও বলেন যে, 'মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা' নিয়ে একটি প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করেছে। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা হবে সে-ইঙ্গিত পাবার পর ঢাকার নবাবরা বিশেষ ক'রে স্যার সলিমুল্লাহসহ এই অঞ্চলের অনেক প্রভাবশালী মুসলিম সামন্ত-ভূস্বামী তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। তার কিছুদিন পর ১৯০৬ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্সের এক

অধিবেশন হয়। মহসিন-উল মূলক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই অধিবেশনের শেষে ৩০শে ডিসেম্বর গঠিত হয় 'মুসলিম লীগ'। অভিজাত ও ঐশ্বর্যশালী মুসলমানরাই অনেক দিন মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেন; সাধারণ মুসলমান জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের পতাকার বাহক হয় অনেক দেরিতে। প্রতিষ্ঠার বহু বছর পরে, বঙ্গভঙ্গ রদ হবারও বহু পরে, লীগ কংগ্রেসের পাশাপাশি আর-একটি রাজনৈতিক দলে এবং শক্তিতে পরিণত হয়।

বঙ্গভঙ্গের একটি ক্ষতিকর দিক হলো, এতে একটি ভাষাভাষী জাতির ঐক্যে বিরাট ফাটল ধরে। নতুন প্রদেশ গঠনের আগ্ থেকেই 'উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজ' এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' গ্রন্থে লিখেছেন :

"বিচিত্র উপাদান এবং নানাবিধ বৈষয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গতি ও শক্তি সঞ্চার করে।...

"জমিদারশ্রেণী—যাঁদের পুরাতন ও নূতন উভয় প্রদেশেই জমিদারি ছিল—এই ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তাঁরা এ পর্যন্ত যে-ভাবে লাভবান হয়ে আসছিলেন বাংলা বিভাগের ফলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা। কারণ, আসামে সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ব বাংলা সংযুক্ত হলে পূর্ব বাংলার জমিদারদের রাজস্ব খাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথও পূর্বোক্ত প্রবন্ধে [বঙ্গবিভাগ] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক্রমে লোপ পাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কার্জন অবশ্য জমিদারদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, ঐ ধরনের পরিবর্তন সরকার চিন্তা করছেন না, কিন্তু এতে তাঁরা স্বস্তি বোধ করেননি। কেউ কেউ এ মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, "আমার জমিদারি একাংশের জন্য যদি লে. গভর্নর এবং রাজস্ব দপ্তর ঢাকায় স্থিতি থাকে, তাহলে সেখানে আমাকে একদল মুহুরি রাখতে হবে, আবার কলকাতায়ও রাখতে হবে।"

"তার উপর বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চাকুরির সম্ভাবনা ও পরিধি সংকুচিত হবে, এইরূপ বাস্তব আশঙ্কায়ও অনেকেই বিচলিত ছিলেন। এ আশঙ্কা আদৌ অমূলক ছিল না, কারণ আইন ব্যবসায়, সরকারি চাকুরি, শিক্ষাক্ষেত্র, ইত্যাদি ইতোমধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল; পক্ষান্তরে দ্রব্যমূল্য ছিল অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির পথে। সুতরাং বেকারীর ভয় বাস্তব।"[৫]

যাইহোক, হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে বাংলার সীমারেখা পুনর্গঠিত করলেও এই ভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু জমিদার ও ধনিক সম্প্রদায় এবং তাদের উচ্চশিক্ষিত সন্তানগণ আরো উগ্র জাতীয়তা-বাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন।

বিরামহীন সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এ সিদ্ধান্তও নেয়া হয় যে বাংলাভাগ বাতিল না করা পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা হবে। কার্জনের বিরুদ্ধে হিন্দুরা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। ১৯০৫-এর ২৫শে আগস্ট কলকাতায় এক সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নিবন্ধে বলেন "আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। — ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকট আত্মনিবেদন।" ৯ই অক্টোবর পশুপতি বসুর বাসভবনে 'বিজয়া সম্মিলন' নামে এক ভাষণে কবি আহ্বান জানান, "হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। ..... একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথ এক নিবন্ধে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান, "আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।"

যাই হোক, ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন কলকাতায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা যানবাহনশূন্য, হাজার হাজার লোক ছুটছে গঙ্গার দিকে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"...ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব—রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা।

"ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী,

সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম।— পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম, রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে— এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখ।...."[৬]

বিকেলে ২৯৪ আপার সারকুলার রোডে ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বৃদ্ধ ও অত্যন্ত অসুস্থ আনন্দ-মোহন বসু সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। 'পঞ্চাশ হাজার লোকের' সেই সমাবেশে ইংরেজিতে যে-শপথবাক্য পাঠ করা হয় তার বাংলা করেন রবীন্দ্রনাথ :

"যেহেতু বাঙালি জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালি জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙালি জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রথম গ্রন্থরচয়িতাদের একজন, কবির পঞ্চাশ বছর-পূর্তি উপলক্ষে রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে ১৩১৮ সালে লিখেছিলেন, "১৩১২ সালে বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সংগীতের দ্বারা, বক্তৃতার দ্বারা, তিনি দেশবাসীর চিত্রকে দেশের আদর্শ ও সত্যের দিকে জাগাইয়া তুলিলেন। তখন স্বাদেশিকতার জীবনের মধ্যাহ্নকাল। কবির বীণা তখন রুদ্রসুরে বাঁধা, তিনি ক্রমাগত ত্যাগের, কঠিন কর্মভার গ্রহণের কথাই আমাদিগকে শুনাইতেছিলেন।"[৭]

বাংলা বিভাগ কার্জনের সময় হলেও ব্যাপারটি তাঁরই একার মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। ১৮৬৮ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট প্রস্তাব করেছিলেন একে দ্বিখণ্ডিত করার। কারণ হিশেবে বলা হয়েছিলো : এর বিশাল আয়তনের জন্য প্রশাসনের কাজে অসুবিধা হয়। তারপর ১৮৭৪-এ আসামকে বাংলা থেকে আলাদা করে একটি প্রদেশ গঠিত হয় চিফ কমিশনারের অধীনে। ১৮৯৬ সালে লে. গভর্নর চার্লস এলিয়ট বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ করেন প্রশাসনিক সুবিধার উদ্দেশ্যে। যাই হোক, কার্জনকে বলা হয় কংগ্রেসবিরোধী বড়লাট। বঙ্গ বিভাগে তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যেমন ছিলো কংগ্রেসের হিন্দু

জাতীয়তাবাদীদের উত্থান কৌশলে প্রতিহত করা, হিন্দু-মুসলমানে একটা বিরোধ বাধিয়ে দেয়া, তেমনি যাঁরা বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করেন তাঁদেরও উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ছিলো না, ছিলো অর্থনৈতিক স্বার্থ, তা আগেই বলেছি। বঙ্গভঙ্গে হিতে বিপরীত হলো। ব্রিটিশবিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তি যারা এতোদিন সরকারের সঙ্গে আপস এবং আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলন সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁরা হয়ে উঠলেন সত্যিকার অর্থে সংগ্রামী। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস আরো শক্তিশালী ও সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বঙ্গভঙ্গ বাতিল করানোর জন্য কয়েক মাস শারীরিকভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য তৎপর থাকেন। অজস্র রচনা, গান, কবিতা, বক্তৃতা রচিত হয় তাঁর দু'হাতে। আগাগোড়াই ছিলেন তিনি সমাজকল্যাণে উৎসাহী, গ্রাম-উন্নয়নে তৎপর, বঙ্গভঙ্গের পরে তাঁর সে-তৎপরতা আরো বেড়ে যায়। অবশ্য আমৃত্যু তিনি পল্লীর মানুষের সমস্যা দূর করার ব্যাপারে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছেন। বাংলায় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন।

বঙ্গভঙ্গের একটি পরোক্ষ শুভ প্রভাব বাংলাদেশে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় লক্ষ্য করা যাবে। তার আগে এখানকার জমিদাররা গরিব প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কলকাতায় গিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন, কিন্তু ১৯০৫-এর পরে তারা উপলব্ধি করেন রাজস্বের অন্তত একটা সামান্য অংশ জনকল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করা প্রয়োজন। তাতে বহু জমিদার, বিশেষ করে হিন্দু জমিদার অসংখ্য ইস্কুল-কলেজ, সেবাসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। তা ছাড়া বহু জমিদার গোপন রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীদের, যাঁদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেয়া হয়েছিলো, অর্থ সাহায্য করতেন, যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো জোরদার করে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ও ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সংখ্যাহীন ব্যক্তির আত্মত্যাগের পরিমাণ এতোই বেশি যে তার পাশে রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করার প্রসঙ্গটি অতি সামান্য। ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছেন, যাঁরা জীবন পর্যন্ত দান করেছেন তাদের অধিকাংশের নাম আজকের প্রজন্মের বিপুল সংখ্যক মানুষ জানে না, অথচ বিশ্ববিখ্যাত কবির এই 'স্যার' বর্জনের ব্যাপারটি বারংবার তাঁর আলোচক ও অনুরাগীদের মুখে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে ষাট বছর যাবৎ যেন তা অবিস্মরণীয় ত্যাগ স্বীকার। একটি পৈশাচিক অন্যায়ের প্রতিবাদে দেশবাসীর দুঃখের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তিনি যা করেছেন তা প্রশংসনীয়, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে সরকারবিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ গনআন্দোলনের সূচনা হয়। অপরদিকে সরকারও বর্বর দমননীতির আশ্রয় নেয়।

"তারই পরিণতি ১৩ এপ্রিল জালিয়ান ওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ড; ১৪ ও ১৫ এপ্রিল গুজরানওয়ালার বিক্ষোভকারীদের উপর এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ এবং মেশিনগান থেকে গুলি চালনা, ১৫ এপ্রিল সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি" ইত্যাদিতে সমস্ত দেশবাসী হতবাক হয়ে যায়।। ঐ ঘটনার পর কোনো জনপ্রিয় ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষেই নীবরতা অবলম্বন করা সম্ভব ছিলো না। ঘটনার প্রায় দেড় মাস পরে ৩০-এ মে ভাইসরয়ের নিকট লেখা একটি চিঠিতে তিনি 'স্যার' উপাধি বর্জনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

'পাঞ্জাবের দুঃখের খবর' মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের 'বুকের পাঁজর পুড়িয়ে' দিয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই, স্যার উপাধি ত্যাগ না করলেও তাঁর সংবেদনশীল পাঠকদের উপলব্ধি করতে কোনোই অসুবিধা হতো না যে ঐ পৈশাচিকতায় তাঁর অন্তরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো। তা ছাড়া দেশে আরো বহু স্যার উপাধি প্রাপ্ত পুরুষ ছিলেন, তারা ঐ খেতাব বর্জন করেননি, তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা ঐ ঘটনার মর্মাহত হননি। কোনো ঘটনায় সমবেদনা প্রকাশের পদ্ধতি সকলের এক রকম নয়। অথচ নগণ্য ব্যতিক্রম বাদে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো কর্মের অব্যাহত সমর্থন প্রদানকারীর সংখ্যা আজো ক্রমবর্ধমান। অনেক মার্কসবাদী সমালোচকও রবীন্দ্রনাথবিষয়ক ঘটনাবলির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে গিয়ে সৎসাহসের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণের জন্য উল্লেখ করতে হয়, কয়েক সপ্তাহ দেরিতে উপাধি বর্জনের কারণ হিসেবে সমবেদনামূলক সমীক্ষা করেছেন অরবিন্দ পোদ্দারের মতো 'দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষক'ও। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' গ্রন্থেও লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পাঞ্জাবের গণমানস কি ভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে তা যেমন তাঁর পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না, তেমনি অনুমান করা সম্ভব ছিল না সরকারি প্রতিহিংসাপরায়ণতার দৌরাত্ম্য।" কথাটি যেমন অনেকখানি সত্য তেমনি এটাও সত্যি যে এতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখকের সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশালকর্মময় জীবনের অধিকারী মহামানবের জন্য এ জাতীয় সমর্থন ও সহানুভূতির প্রয়োজন হয় না। আবেগবর্জিত ও বস্তুনিষ্ঠ বিচারে তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আজ আর একেবারেই নেই।

যাই হোক, লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে লিখিত পত্রে কবির বক্তব্য খুবই স্পষ্ট যেখানে কোনো ফাঁকি নেই :

"হতভাগ্য পাঞ্জাবীদিগকে যে-রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ড প্রয়োগবিধির বিশেষত্ব, আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতম দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে-প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ

নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল.... অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি।"

রবীন্দ্রনাথ হতভাগ্য মানুষের পাশে নেমে না দাঁড়ালেও তাদের বেদনায় বেদনার্ত হয়েছিলেন তার মূল্যও অল্প নয়। ত্যাগ ও আত্মত্যাগের পরিমাণ আছে। একটি চরম নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে একটা খেতাব ফিরিয়ে দেয়া বিশাল কোনো ত্যাগ নয়। জাঁ-পল সাঁর্ত্রে নোবেল পুরস্কারটিই প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেটি অপেক্ষাকৃত বড় ত্যাগ ও অনমনীয়তার উদাহরণ। হত্যাকাণ্ডের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে "১৯২০ সনের ১৩ এপ্রিল বোম্বাইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও শহীদদের স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা মহম্মদ আলী জিন্নার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী প্রেরণ করেন, তাতে তিনি বলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগে যে অশুভ শুক্তির ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে তা আসলে এক দানবীয় যুদ্ধের দানবিক সন্তান"।

অরবিন্দ পোদ্দারও লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের নাইট-খেতাব পরিত্যাগের সময়-নির্বাচন, প্রকৃত উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা, ইত্যাদি প্রসঙ্গে কোন কোন সময় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। অতীতে, ১৯২৬ সনে, তাঁকে একবার জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, আত্মাভিমান নয়, রাজকীয় খেতাবের প্রতি অবজ্ঞাও নয়, জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর নৈতিক ক্রোধ প্রকাশ করার জন্যই তিনি খেতাব-বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।"[৮]

"রবীন্দ্রনাথের খেতাব বর্জনের মত ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনাকে" সেকালের কংগ্রেস নেতারাও বিশেষ গুরুত্ব দেননি; সেজন্যও রবীন্দ্র-ভক্তদের অনেকে খেদ প্রকাশ করেছেন। "অমল হোমের বিবরণ থেকে জানা যায়, অমৃতসর কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাংলার প্রতিনিধিগণসহ সকলেই কোন না কোন অছিলায় পাশ কাটিয়ে যান, সৈয়দ হোসেন প্রস্তাব উত্থাপনে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু সভাপতি মোতিলাল নেহেরু কোন অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে তাঁকে প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাননি।"[৯] উল্লেখযোগ্য যে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গঠিত কংগ্রেসের তদন্ত কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন।

১৯১৫ সালে যখন সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে 'নাইটহুড' বা 'স্যার' খেতাব প্রদান করা হয় তখন ভারতের বহু জাতীয়তাবাদী নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মী

অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। "চিত্তরঞ্জন দাস নাকি তখন দুঃখে লজ্জায় কেঁদেছিলেন"। আমার এখানে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথকে ছোটো বা সমালোচনা করা নয়, আমাদের দেশের অনেক আলোচকের ছোটো জিনিসকে নিষ্প্রয়োজনে বড় ক'রে প্রচার করার প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করা মাত্র।

তিন

আমার এই সংক্ষিপ্ত লেখায় বিস্তারিত আলোচনার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির ও রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার খোঁজ করতে গেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি এবং রাজনীতির প্রশ্নে তিনি তাঁর সাহিত্যে — গল্প-উপন্যাস, কবিতা-গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও চিঠি-পত্র ইত্যাদিতে কি মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা বিচার করা প্রয়োজন। তাঁর বিপুল সংখ্যক কবিতা-গান রয়েছে যার বিষয়বস্তু রাজনীতি : জাতীয়তাবাদ অথবা দেশপ্রেম। কখনোবা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কোনো লেখায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা। একটি পরাধীন দেশে মানবতার অপমান দেখে তাঁর চিত্ত ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়েছিলো, দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার অবসান কামনা করেছিলেন তিনি। শুনি তাঁর আহ্বান ১৩০০ সনে প্রকাশিত 'চিত্রা'-র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়—

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।...
এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী!.....
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।...

উনিশ শতকের শেষের দশকে রচিত হয়েছিলো এই কবিতা। তারপর আরো সক্রিয় হয়েছেন কবি, বাংলার মানুষের, বিশেষ করে পল্লীর কৃষক ও অকৃষিজীবী দরিদ্র জনগণের দুর্দশা দেখেছেন, দেখেছেন জাতীয়তাবাদী চেতনার বহুমাত্রিক বিকাশ এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের উত্থান। অপর দিকে লক্ষ্য করেছেন সরকারের ক্রমবর্ধমান দমননীতি। সরকার ও সাধারণের সঙ্গে সংঘাতের সাক্ষী তিনি। চার

পাশের ঘটনাবলি—বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা—হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের অন্যতম বিষয়। সৃষ্টিশীল লেখার মধ্যে কবিতাগানের পরেই তাঁর তিনটি উপন্যাস 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়'-এর সেকালের রাজনীতির ধারা, বিশেষ ক'রে উগ্র রাজনৈতিক কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর অসদয় মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া কয়েকটি ছোটোগল্পেরও যেমন 'শেষ কথা', 'বদনাম'-এর পাত্রপাত্রী বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের কর্মী। অগ্নিযুগের রাজবন্দিরা কারাগারে বসে বইপত্র পড়তেন। বিশাল প্রতিভা— বাংলা ভাষার গৌরব রবীন্দ্রনাথের বইও তাঁরা আগ্রহ নিয়ে পড়তেন।কিন্তু ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রত্যাশাই যে পূরণ করতে পারেননি তাই নয়, তাদের যেন বিদ্রূপ করেছেন।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলো, বাজেয়াপ্ত হবার পর উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়, কিন্তু এর লেখক ও প্রকাশককে সইতে হয় বৈষয়িক ক্ষতি। তাই শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে বইটির বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ উচ্চারিত হোক। শরৎচন্দ্রের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তিনি যে চিঠি লেখেন তাতে কবির সৎসাহসের অভাব এবং ইংরেজপ্রীতির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শরৎচন্দ্রকে লেখেন, "আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম— একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্নমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।" বিখ্যাত সেই চিঠিতে তিনি আরো লিখেছিলেন, "বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।" অত্যন্ত দাস্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন উক্তি, বিশেষ করে এ উক্তি তখন করা হয়েছে যখন বাংলার অগ্নিসন্তানরা দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরছেন।

'ঘরে-বাইরে'-এর অনেক বছর পরে প্রকাশিত হয় 'চার অধ্যায়'। চিন্মোহন সেহানবীশ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' বইতে লিখেছেন, "১৯৩৪ সালে 'চার অধ্যায়' প্রকাশ গভীরভাবে বিচলিত, বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ করেছিল বাংলাদেশের বহু রবীন্দ্র-অনুরাগীকে। বিশেষ করেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিপ্লবী তরুণেরা উপন্যাসের কাহিনী এবং ভূমিকায় ব্রহ্ম-বান্ধবের একটি মন্তব্যের উল্লেখে। এটা উপলব্ধি করে কবি পরবর্তী সংস্করণে ভূমিকাটি বাদ দেন এবং একটি 'কৈফিয়ত' যোগ করেন (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩ পৃঃ ৫৪১-৪৫)। এতে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়, কিন্তু সর্বাংশে হয়নি। ..... দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজার বোমা মামলার প্রধান নেতা হরিনারায়ণ চন্দ মহাশয় লিখেছেন :

". . . ক্যাম্পে রবি ঠাকুরের লেখা 'চার অধ্যায়' বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার পুস্তকের ভূমিকা লইয়া।"[১০]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কৃষকও কমিউনিস্ট-নেতা জিতেন ঘোষ তাঁর 'জেল থেকে জেলে' স্মৃতিচারণমূলক বইতে লিখেছেন, 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানা দেউলী ক্যাম্পে বিরূপ সমালোচনার ঝড় তুলে দিয়েছিলো। সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করতে গিয়ে তাঁর লেখনী থেকে যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছিলো, তাতে অনেক সন্ত্রাসবাদী দেশকর্মীকেই মর্মাহত হতে হয়েছিলো . . .।" ১১

বিপ্লবী দলের সদস্য ও লেখক সরোজ আচার্য সাক্ষ্য দিয়েছেন : "রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' যখন বার হয় আমরা তখন রাজবন্দী, বাংলাদেশের বাইরে আজমীর থেকে মাইল চল্লিশ দূরে দেউলী বন্দীনিবাসের বাসিন্দা আমরা। — আমরা সে-বই আগাগোড়া পড়লাম এক দমে এক এক টানে। ঠিক সে-সময় আমাদের মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল তা এখনো অনায়াসে স্মরণ করতে পারি। — ভালো মানুষ আমরা নই, বরং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা নিজেদের 'লক্ষ্মীছাড়ার দল' জেনেই খুশি।— আমরা যখন ঘরে গোল হয়ে দল বেঁধে পড়লাম, ইন্দ্রনাথ, এলা, অতীন্দ্রের কাহিনী তখন সত্যই আমরা যেন অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম! ঘরে ঘরে বিষাদের ছায়া, চাপা সুরে সকাতর প্রশ্ন — রবীন্দ্রনাথ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, তিনি এই বই লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ জুড়ে অ্যাণ্ডারসনী তাণ্ডব চলছে?" ১২

যাই হোক, যিনি বড় তাঁর কাছে মানুষের প্রত্যাশাও বড়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের বিপরীত শিবিরে অবস্থান করে তাদের প্রত্যাশাইবা পূরণ করবেন কি ভাবে? যদিও সম্প্রতি জানা গেছে, ব্রিটিশ-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তারা "১৯৩১ সালের প্রেস এমারজেন্সী পাওয়ার এর প্রয়োগ করে বইটি বাজেয়াপ্ত করতে" পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ "অভিযোগ এই যে বাংলার বিপ্লববাদের গুণগান গাওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে।"

রবীন্দ্রনাথের কপাল মন্দ, তাঁকে উভয় পক্ষই একটু অতিরিক্ত ভুল বুঝেছিলো।

তবে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের বিরাগভাজন হয়েছেন সঙ্গত কারণেই। যদিও, পক্ষান্তরে, তাঁর কবিতা ও গানের অজস্র পঙ্‌ক্তি বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। যেমন আজকের মতো সেদিনও এ দুটি পঙ্‌ক্তি আত্মত্যাগী তরুণদের উদ্দীপ্ত করেছে :

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

ড. নাজমা জেসমিন চৌধুরী তাঁর 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' [ঢাকা ১৯৮০] গ্রন্থে লিখেছেন, "আত্মত্যাগ, আত্মশক্তি অর্জন ও জনসংযোগের ওপর রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই জোর দিয়েছেন। তিনি ছিলেন তাত্ত্বিক। তাই তাঁর লেখায় কর্তব্যবুদ্ধির তুলনায় শুভবুদ্ধির প্রাধান্য দেখা যায়।

"শিক্ষিত সমাজের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস, তা সে যতই মহৎ উদ্দেশ্যে হোক না কেন তা রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে।"

নাজমা জেসমিন চৌধুরী কবির তিনটি উপন্যাস পর্যালোচনা করে যথার্থই লিখেছেন, "ব্যর্থ রাজনীতির কথা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আছে কিন্তু সঠিক রাজনীতির পথনির্দেশ সেখানে নেই। —রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাস্তববাদিতার অসদ্ভাব নেই। কিন্তু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পরিহার করে যখন ভাববাদী হয়ে ওঠেন তখন মনে হয় তিনি আবদ্ধ আছেন প্রাচ্যের ভাববাদিতা ও পশ্চিমের বুর্জোয়া উদারনীতির নম্র অথচ অনমনীয় এবং পরস্পর-প্রবিষ্ট-বন্ধনে। এটা দুর্ভাগ্যজনক রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষের পক্ষে।"[১৩]

বিপ্লবী রাজনীতি, যাকে অন্যায়ভাবে আখ্যা দেয়া হয়েছিলো সন্ত্রাসবাদিতা, রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখতেন, পক্ষান্তরে বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন সে সম্পর্কে সম্প্রতি (১৯৮৪) চিন্মোহন সেহানবীশ প্রণয়ন করেছেন একটি নাতিদীর্ঘ অথচ মূল্যবান গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ'। এ বই পড়ে আমার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে—রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক সত্তা সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ ধারণার অবসান হবে। এ প্রসঙ্গে আর দুটি বইও পাঠকের জন্য বিশেষ সহায়ক, সেগুলো মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮০-১৯৬১) 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' (১৯৫৩) এবং 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' (৩য় সং, ১৯৬৯)। আজ জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক লেখায় বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত না হলেও তার সংস্কারমূলক প্রস্তাব নিয়ে ভেবেছেন। ভূপেন দত্তের ভাষায়, "রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতা এবং Parallel Government স্থাপন করিয়া দেশ মুক্ত করার প্ল্যানের পর, অনুমান হয়, ১৯০৫ খ্রীঃ বারীন্দ্র [কুমার ঘোষ] প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কর্মীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পত্র লিখি যে, আমরা ভারতীয় সভার সহযোগে কর্ম করিতে প্রস্তুত নই, তাঁহার [কবির] সহিত সংযুক্তভাবে কর্ম করিতে চাই। ইহাতে তিনি তাঁহার দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসায় আমাকে আহ্বান করেন এবং বলেন, 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এই বিষয়ে কথা কও bring coal to Newcastle।" 'প্যারালাল গভর্নমেন্ট' বলতে এখানে বলা হয়েছে গ্রামের পঞ্চায়েত সরকার, যা হবে স্বাবলম্বী।

মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত যে কোনো কর্মীকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, কিন্তু সকলের অনেক কাজের পদ্ধতির প্রতি তাঁর আস্থা ছিলো না। সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিলো না, রবীন্দ্ররচনা পড়ে তাই

প্রতীয়মান হবে, কিন্তু বিপ্লবীদের কর্মের সিদ্ধি সম্পর্কে ছিলো তার গভীর সন্দেহ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীরা তাঁর অন্তরে একটি স্থান করে নিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় জীবনের একেবারে শেষ দিকের দুটি ছোটগল্প 'শেষ কথা' ও 'বদনাম'-এর নায়কদ্বয়ও বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য। 'বদনাম'-এ বিপ্লবীদের শ্রদ্ধার আসনই দেয়া হয়েছে।

'গীতবিতানে'র অন্তত ছেচল্লিশটি গানে কবির যে-স্বদেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার মূল্য অসামান্য। দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে ও-সব সংগীত পরিবেশিত হয়ে আসছে। ভবিষ্যতেও হবে।

চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন এই ভাবে :

'যুগান্তর' দল ও পরে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (এখন এখানকার [পশ্চিমবঙ্গের] কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সমর্থক] শ্রী সীতাংশু দত্তরায়ের মুখে শুনেছি ১৯৩৪ সালে তিনি যখন মেদিনীপুর জেলে আটক তখন চট্টগ্রাম দলের তরুণ বিপ্লবী, কৃষ্ণ চৌধুরীকে সেখানে আনা হয় ফাঁসির আসামী হিসেবে (চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের একেবারে শেষ পর্বে প্রকাশ্য দিবালোকে ক্রিকেট খেলার মাঠে সাহেবদের উপর সশস্ত্র হামলা চালানোর অপরাধে)। সীতাংশুবাবু বলেছেন, ফাঁসির আগের ক'দিন সে মেদিনীপুর জেলে সারাদিন একটি গান ফিরে ফিরে গাইত :

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা' আর অন্য রাজবন্দিদের ডেকে বলত, 'ঐ গান গাইতে গাইতেই শেষদিনও সে বধ্যভূমিতে যাবে এবং তার গান যখন আর শুনতে পাবেন না, তখন বুঝবেন সব শেষ।'

সত্যই ঐ তরুণ তাই করেছিল শেষ দিন।"[১৪]

'মুক্তধারা' দৃশ্যকাব্য বা নাটকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী বা গণমুখী ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় :

রাজা রণজিৎ বলছেন : "শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে।"

মন্ত্রীকে বলতে শুনি : "রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।"

তবে এটা সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথের রূপক-প্রতীক ও বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্ম ও চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্য সকল সময় সাধারণ পাঠকের কান পর্যন্ত পৌঁছেনি। সে-ব্যর্থতা তাঁর নয়, তাঁর শিল্পের রস-আস্বাদনকারীদের। কেউ যখন দুর্বলতাবশত সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায় তখন তার কানের কাছে গিয়ে ভালো ভালো কথা শোনানোর

চেয়ে তাৎক্ষণিক যা দরকার তা হলো তাকে ধাক্কা দিয়ে আগে তার চেতনা ফিরিয়ে আনা। পরাধীন ভারতের বিপুল মানুষের চেতনার মান এতো নিচে ছিলো যে রবীন্দ্রনাথের উঁচু চিন্তাধারা ও সংবেদনশীলতার মর্ম উপলব্ধি করা ছিলো তাদের সাধ্যের বাইরে। হয়তো কবি তা উপলব্ধি করেই আত্মোন্নতি ও গ্রামের মানুষের উপকার হতে পারে এমন সব সংস্কারমূলক কাজের ওপরই অধিক জোর দিয়েছেন।

চার

রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও শিল্পী। একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁকে রাজনীতির প্রসঙ্গে কথা বলতেই হয়েছে, একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অন্যান্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। রাজনীতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বও রাজনৈতিক নেতাদের। রবীন্দ্রনাথ পারতেন শুধু তাঁর অবস্থান থেকে তাঁদের কাজে সাহায্য, সহযোগিতা বা বিরোধিতা করতে। প্রখর রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, রাজনীতির প্রধানত দুটি ধারা, একটি প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, অন্যটি গোপন হিংসাত্মক রাজনীতি। আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের এই দুই ধারায় নেতাদের সঙ্গেই কমবেশি সৌহার্দ্য ও যোগাযোগ ছিলো।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে গান্ধী, তিলক, জিন্নাহ, গোখলে, মালব্য, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, মতিলাল ও জওহরলাল নেহেরু, বিপিন পাল, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। যদিও এঁদের সকলের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডে কবির সমর্থন ছিলো না।

মহারাষ্ট্রের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা ও 'গণপতি পূজা' ও 'শিবাজী উৎসব'-এর প্রবর্তক বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৭ সালে গ্রেফতার হলে তাঁর মুক্তির জন্য অন্যান্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বিশেষ তৎপর হন। ডবল্যু. সি. র‍্যান্ড এবং আয়ার্স্ট নামে দু'জন ইংরেজ নিহত হলে সরকার সন্দেহ করে ঐ হত্যাকাণ্ডের পেছনে তিলকের মদদ রয়েছে। তিলক কারারুদ্ধ হবার পর তাঁর মামলা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে 'তিলক-তহবিল' গঠিত হয়। ঐ তহবিল গঠনের পেছনে যাঁরা বিশেষ সক্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। যাই হোক, ঐ ঘটনার পর তিলক সারা দেশে হিন্দু সমাজে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে কবির সম্পর্ক সর্বদা মধুর ছিলো না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর 'স্বরাজ দল'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের একজন বিরূপ সমালোচক ছিলেন এবং তাঁর সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনকে কবি কখনো খাটো করে দেখেননি। ১৯০৬ সালে বরিশালে যে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেন বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির ইতিহাসে বরিশাল-সম্মেলনের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল। নবগঠিত প্রদেশ পূর্ববঙ্গের গবর্নর স্যার র‍্যামফিল্ড ফুলার নির্দেশ ছিলো প্রকাশেও 'বন্দেমাতরম্' স্লোগান দেয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ সেই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে পথ দিয়ে যাবার সময় পুলিশ তাঁদের আক্রমণ করে। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেফতার হন। তাঁর গ্রেফতারের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারা বঙ্গে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় :

> স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে বরিশাল সম্মেলন একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। সেদিন সেই ঘটনার ভিতর দিয়ে আমাদের অগ্নিশুদ্ধ হবার সুযোগ এসেছিল এবং আমাদের জাতীয়তাবাদ কতখানি দৃঢ়তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলার রাজনীতিতে বহু তেজস্বী তরুণের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের অনুনয়-বিনয়মূলক রাজনীতির বিকল্প পথ অনুসন্ধান করেন : রাজনীতিতে দেখা দেয় নরমপন্থী ও উগ্রপন্থী দুটি ধারা। উগ্রপন্থীদের চিন্তাধারা ছিলো বিপ্লবী। কেম্ব্রিজের ট্রাইপস এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অরবিন্দ ঘোষদের মতো তরুণরা এই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়ায় তা নতুন মাত্রা পায়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অরবিন্দ বরোদা কলেজের অধ্যক্ষের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৬ সালে পি. মিত্রের (প্রমথনাথ মিত্র) পরিচালনায় বিপ্লবীদের দ্বারা যে 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয় তার সহ-সভাপতি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। এঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য চরমপন্থীদেরও সকলের মতে ঐক্য ছিলো না। যেমন অরবিন্দ চাইতেন 'স্বাধীনতা', পক্ষান্তরে বিপিন পাল ইংরেজের অধীনে 'স্বায়ত্তশাসন'। অবিলম্বে অরবিন্দ বাংলাদেশে একজন শ্রদ্ধাস্পদ নেতায় পরিণত হন। এর মধ্যে ১৯০৮ সালে তাঁর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় 'রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক' লেখা প্রকাশের জন্য এবং আলিপুর বোমা মামলায় তিনি অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। দেশবন্ধু সেই বিখ্যাত মামলা পরিচালনা করেন এবং অরবিন্দ মুক্তি পান। অরবিন্দের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ উত্থাপনের সংবাদ শুনে, তাঁর রাজনৈতিক ধারার

বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' কবিতায় তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন :

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, দেশবন্ধু স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। .....
বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান-মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—

....

...দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।...

গান্ধীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ প্রথম প্রকাশ পায় ১৯১২ সালে এন্‌ড্রুজ সাহেবকে লেখা একটি চিঠিতে। তাঁকে কবি লেখেন, "গান্ধী এবং তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আফ্রিকায় আমাদের দাবি নিয়ে লড়ছেন।" এন্‌ড্রুজই গান্ধীর কাছে কবির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। যেখানেই মানবতা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে সেখানেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন কবি : নির্যাতিতের পক্ষে তাঁর নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন সকল সময়ই পাওয়া গেছে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে গান্ধীজী ও তাঁর পত্নী কস্তুরবাই কবির সঙ্গে দেখা করেন। তারপর থেকে কবির মৃত্যু পর্যন্ত পঁচিশ বছর তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো, যদিও তাঁদের মতের গড়মিল ছিলো বহু ব্যাপারে। বিশেষ করে, ১৯১৯ সাল থেকেই তাঁদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ বেশ ভালো রকম ভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঐ বছর এপ্রিল মাসে, ভারতের রাজনীতিতে সে এক উত্তাল সময়, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে সম্বোধন করে এক খোলা চিঠিতে লেখেন, "আপনার শিক্ষা এই যে, মানুষ সত্যের দ্বারা কল্যাণের দ্বারা অন্যায় ও অমঙ্গল প্রতিহত করবে। কিন্তু এ সংগ্রাম বীরের সংগ্রাম। যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয় এ সংগ্রাম তাদের জন্য নয়। এক পক্ষের পাপ অন্য পক্ষের পাপকে ডেকে আনে, এক পক্ষের অবিচার ও অন্যায় লাঞ্ছনা অন্য পক্ষকে হিংসার পথে প্রবৃত্ত করে। দুঃখের কথা, এই রকম এবং অমঙ্গলের শক্তি উপস্থিত হয়েছে আমাদের দেশে।...

"আমি বারবার বলেছি, স্বাধীনতা এমন এক অমূল্য সম্পদ যা ভিক্ষা দ্বারা কিছুতেই লভ্য হতে পারে না। স্বাধীনতা পেতে হলে তাকে অর্জন করে নিতে হবে। ভারত স্বাধীনতা অর্জনের গৌরব তখনি লাভ করবে যখন সে বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করতে পারবে যে যারা গায়ের জোরে দেশ শাসন করছে আত্মিক শক্তিতে ভারতবাসী তাদের চেয়ে বড়।"

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী উভয়েই শান্তিবাদী এবং সহযোগিতামূলক ও আপসকামী রাজনীতির প্রবক্তা। তা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, গান্ধীর চেয়ে কবি ছিলেন অনেক বেশি অকপট ও স্পষ্ট। গান্ধীর বড় অবদান রাজনীতিকে গণমুখী করে তোলা।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে তখন গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্পর্কে বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথের সায় ছিলো না। কবির ভাষায়, "আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে আমাদের স্বাভাবিক সর্বশেষ নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে যদি অসহযোগের আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে তো তা সত্য বলেই হবে গৌরবোজ্জ্বল; আর এ যদি ভিক্ষা বৃত্তিরই দোসর হয়ে থাকে তো একে আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।" গান্ধীজীর স্বরাজের ধারণা এবং তা অর্জনের উপায়ও অস্পষ্ট। "...বলা বাহুল্য, ঐ স্বরাজ স্বাধীনতার প্রতিশব্দ ছিলো না। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২১)। ঐ অধিবেশনে মৌলানা হসরত মোহানি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, স্বরাজের প্রকৃত অর্থ হলো বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। গান্ধীজী অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মৌলানার দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন এবং তাঁরই পীড়াপীড়িতে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। গান্ধীজীর মতে, মৌলানার প্রস্তাব 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার' পরিচায়ক এবং এর তাৎপর্য হলো 'অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া'।"[১৫]

১৯২৫ সালে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসেন কবির সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে। মত ও পথে কোনো মিল নেই কিন্তু পরস্পরের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এই দুই মহামানব। ১৯৩২ সালে গান্ধীজীর কারাবরোধকালে কবি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানান। একদিন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, ১৯৩৬ সালে গান্ধীজী শান্তি নিকেতনের জন্য কবিকে ষাট হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে দেন। ১৯৩৮ ও '৪০ সালেও তাঁদের মধ্যে জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারে মতবিনিময় হয়।

গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যাপারে নীতিগত ও রুচিগত বিরোধ ছিলো। বাধ্যতামূলক ও নেতিবাচক কোনো বিধান, লোক-দেখানো হৈচৈ, ভাবাবেগপ্রসূত

যুক্তিহীন কাজকর্ম ইত্যাদিতে কবির সমর্থন ছিলো না। তাই তাঁত বোনা, চরকায় সুতা কাটা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কর্তব্য, গান্ধীজীর এই ধারণাকে কবি অপছন্দ করেছেন। পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ চরকায় সুতা কাটার মতো সহজ ব্যাপার দ্বারা সাধিত হবে তা বিশ্বাস করতেন না কবি। তা ছাড়া ধনীনির্ধন সকলে মিলে একযোগে সুতা কাটবে এই নির্দেশে কবি বরং বিরক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমার মনে হয়, এই লোকপ্রিয় মনোভাব উদ্দাম উত্তেজনার নামান্তর মাত্র, নৈতিক বিশ্বাসের উপর এর ভিত্ গড়ে ওঠেনি।"

যে-কাজটির জন্য বিরাট ত্যাগ ও সূক্ষ্ম রণকৌশল প্রয়োজন তার জন্য একটি সস্তা পন্থা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। 'চরকা' শীর্ষক এক দীর্ঘ রচনায় ১৩৩২ সালে কবি লেখেন :

১. চরকা-চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করি নি অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছেন।

২. এই জন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। ..... আশা করি আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত; কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

৩. কেউ কেউ বলবেন, 'তুমি যে সমবায় জীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাই তো তাই।' আমি তা মানি না।

৪. মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন সায় দেয় না। কেননা যাকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্য শক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রবল পরাক্রান্ত মহান স্বাধীনতাসংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন বয়সে রবীন্দ্রনাথের পৌত্র বা দৌহিত্রের মতো, কিন্তু তাঁর পৌরুষ ও দেশপ্রেমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কবি, যদিও তাঁদের মতাদর্শ ও কর্মপন্থা ছিলো ভিন্ন। ২০-এর দশকেই বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উত্থান ঘটে এই অপরাজেয়, আপসহীন ও সাহসী পুরুষের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বতোভাবে মধ্যপন্থী, নরমপন্থী বললে আরো ভালো হয়, কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থী। 'সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থের প্রণেতা পরিমল কুমার ঘোষ লিখেছেন, "ত্রিশের দশকে সুভাষচন্দ্র

ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক্রমে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন এটা আপসপন্থা। কংগ্রেস সেদিন তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য না করে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলো বিভিন্ন প্রদেশে। কার্যত সেই মন্ত্রিসভাগুলি ছিল সর্বতোভাবে ইংরেজ সরকারের অধীন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন : ভারতবর্ষে একটা পাল্টা গণ-সরকার করতে হবে, ভারতবাসীদের একমাত্র আনুগত্য থাকবে সেই সরকারেরই প্রতি, সকল সমস্যার সমাধান ও বিচার পাবার আশায় মানুষ যাবে সেই সরকারেরই কাছে; ফলে ইংরেজ সরকার কার্যত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং তার আর কোনো ভিত্তি থাকবে না।"[১৬]

সুভাষচন্দ্রের এ জাতীয় প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেসের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতারই সমর্থন ছিলো না, রবীন্দ্রনাথের তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ক্ষমতায় কোনো সংশয় ছিলো না বয়োবৃদ্ধ কবির। ১৯৩৯-এর ১৪ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "ফেব্রুয়ারির আরম্ভে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। .....৪ঠা ফেব্রুয়ারি অভিনয়ের প্রথম দিন। সেই দিন আমি রঙ্গশালায় [তোমাকে] প্রকাশ্য অভিনন্দন দিতে চাই।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে সেই অভিনন্দন সভাটি হতে পারে নি। ২৭শে জানুয়ারি কবি নেতাজীকে আর এক চিঠিতে লেখেন, "সম্পূর্ণ অনিবার্য কারণে এবং শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি হওয়াতে আপাতত তোমার অভিনন্দন-সভা বন্ধ রাখতে বাধ্য হতে হোলো।" সেই 'অনিবার্য কারণটি' আজো অজ্ঞাত, হয়তো হবে তা রাজনৈতিক, কারণ ততোদিনে নেতাজী সরকারের অতিশয় অপ্রিয় ব্যক্তি। যাই হোক, অভিনন্দন সভার জন্য রচিত এবং 'দেশনায়ক নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত অভিনন্দনপত্রে কবি লেখেন :

"বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি, বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই।.....

"...এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠা শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

"সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মনপীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মান নি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।"

আমৃত্যু নানা ধরনের সামাজিক-মানবিক দায়িত্ব পালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সে-সবের অনেকগুলো একই সঙ্গে রাজনৈতিক দায়িত্বও। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কবি নজরুল ইসলাম যখন ১৯২৩ সালে অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন তখন তাঁকে অনশন ভঙ্গের জন্য অনুরোধ করে হুগলি জেলের ঠিকানায় কবি তারবার্তা পাঠান। ইতোমধ্যে হুগলি জেল থেকে নজরুলকে বহরামপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো। যাইহোক, ঐ অজুহাতেই কর্তৃপক্ষ তারবার্তাটি নজরুলকে দেবার ব্যবস্থা না করে রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফেরত পাঠায়। কর্তৃপক্ষের এই ঔদাসীন্য ও চাতুর্যে যুক্তিশীল ও কর্তব্যপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবেই আহত হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা তাঁর ছোটো চিঠিটি :

কল্যাণীয়েষু,

রথী, নজরুল ইসলামকে Presidency Jail-এর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলুম Give up hunger strike, our literature claims you. জেল থেকে Memo এসেছে The addressee not found অর্থাৎ ওরা আমার message দিতে চায় না। কেননা, নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চিয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ সকল শ্রেণীর—নরমপন্থী ও চরমপন্থী—নেতার ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখার অব্যাহত চেষ্টা করেছেন। একজন মহান কবির কাছ থেকে এটাও বড় প্রাপ্তি।

পাঁচ

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারটি এক পর্যায়ে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় থেকে একটি বড় রকমের রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গের সময় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তরফ থেকে অত্যন্ত জোরে ও সমস্বরে উচ্চারিত হয় বটে যে বাঙালিমাত্রেই ভাই ভাই, কিন্তু কোনো ফল হয় না, তাতে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের ভেতরকার দূরত্ব সংকুচিত হয় না। বরং অনেক দিনের দূরত্ব রূপ ধারণ করে বিরোধের এবং এই বিরোধ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য প্রস্তুত ছিলো তৃতীয়-পক্ষ : ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার। তের শতক থেকে পলাশীতে সিরাজের পতন পর্যন্ত পাঁচশ বছর মুসলমান সুলতান সুবেদার নবাব ইত্যাদি বাংলাদেশ শাসন করেছেন, তবে উচ্চতম আসনখানিতে মুসলমান উপবিষ্ট থাকলেও তাঁদের অমাত্য-আমলা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবেই দেশ পরিচালনা করেছে। তাছাড়া রাজা গণেশ, তোডরমল বা মানসিংহও মাঝে মাঝে কিছুকাল বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৭২ সালে প্রথম আদমশুমারী অনুসারে বাংলার ৩, ৫৭, ৬৯, ৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের শতকরা হার ছিলো যথাক্রমে ৫০.১ এবং ৪৮.১ এবং ৪৮.৮। অবশ্য এই হার সময় সময় ওঠানামা করলেও মোটামুটি দেখা যায় বাংলাদেশে এই দুই সম্প্রদায় প্রায় সমান সমান। ইংরেজরা এদেশ দখল করলে হিন্দু বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বাংলায় একটি শক্তিশালী হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও এলিট সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে অভিমানবশত আত্মঘাতী মুসলমানরা বিত্ত ও বিদ্যায় মনোযোগ না দিয়ে নিষ্ক্রিয় থেকে অতিদ্রুত পিছিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে শিক্ষা সংস্কৃতিতে অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সকল দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের বিরোধের সূচনা হয় এবং ইংরেজ শাসনের একশ বছরের মধ্যে সে-বিরোধ ব্যাপক ও বিরক্তিকর রূপ নেয়। বাংলা বিভাগের সময় মুসলমানরা হিন্দুদের বিপরীত দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। শতাধিক বছর অবহেলা-অনাদর সহ্য করার পর তাদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে দেখা দেয়। অপর দিকে অনেক দিন অনাত্মীয়-সুলভ আচরণ করার পর বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে বা তারও কিছুকাল আগে থেকেই হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ অনুধাবন করতে শুরু করেন যে মুসলমানদের দূরে ঠেলে রাখার পরিণাম প্রাঞ্জল হতে যাচ্ছে না। বিষয়টি যখন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে তাঁর অকপট মন্তব্য প্রকাশ করেন। সুতরাং রবীন্দ্ররাজনীতি আলোচনার সময় এ প্রসঙ্গটি না এসে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' নিবন্ধে লেখেন, "আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতি ও শান্তি স্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব-স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজ বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইয়া পড়িবেই।"

বিদেশ থেকে মুসলমানরা ভারতে আসায় হিন্দু সমাজে যে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোটেই হয়নি তা নয়। যদিও বৌদ্ধ শাসকরা বিদেশী ছিলেন না কিন্তু তবু তাঁদের শাসনামলে হিন্দুরা শঙ্কিত ছিলো তাদের ধর্ম ও সমাজ নিয়ে। যাইহোক, মুসলমানরা আসার পর এবং এদেশের নিপীড়িতশ্রেণীর একটি বিশাল অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সমাজে একটা 'সংঘাত আসিয়া উপস্থিত' হলেও "তখন হিন্দু সমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।.....

".....হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান...তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।" [স্বদেশী সমাজ]

কবি একটি কথা খোলাসা করে বলেননি যে অর্থনৈতিক বৈষম্য যেখানে প্রবল সেখানে মানুষে মানুষে মিলনের ধ্বনি অর্থহীন। অমিলের জন্য গোলামালটা কোথায় সে-কথা না উল্লেখ করেও 'সমস্যা' নিবন্ধে ১৩১৫ সনে তিনি বলেন, "এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব...এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।" অর্থাৎ গোঁজামিল কোনো মিল নয় সে-বিষয়ের প্রতিই কবি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণগুলোও খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩২৯ সনে কালিদাস নাগকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেন, "আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি

কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক পান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাঁকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে-দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?" [হিন্দু-মুসলমান/কালান্তর]

একই ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে। "...একধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে, আর জাজিমের উপরে বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিলো। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের।" কবির লেখা থেকেই জানা যায়, সদয় আচরণ করে জমিদার হিসেবে তিনি মুসলমান-প্রজাদের মন জয় করতে ও আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। আবার আমাকে উদ্ধৃতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। একই প্রবন্ধে তিনি বলছেন, "আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে-নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনি তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।"

মানুষ-রবীন্দ্রনাথ, কবি-রবীন্দ্রনাথ, জমিদার-রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ভালো মানুষ ছিলেন বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন তার জমিদারির মুসলমান প্রজাদের 'অকৃত্রিম বন্ধু'। তার সম্প্রদায়ের সকলেই, অধিকাংশ, তাঁর মতো হতে পারেননি বলেই বিরোধ ও মনোমালিন্য শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। তাতে দুই সম্প্রদায়ের কোনোটিই বিশেষ লাভবান হয়নি। 'নিজের ঘর সামলানো অসাধ্য' তা জেনেও কবি সুপারিশ করেছেন "নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে, হিন্দুমুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে; সেই জন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে।" কিন্তু কবির কথার কর্ণপাত না করার মতো মানুষের সংখ্যাই ছিলো সেদিন বেশি।

কোনো সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সময় অপেক্ষা করে না। যথাসময় 'ভারত শাসন আইন ১৯৩৫' পাস হলো। "মুসলমান প্রধান বাংলাদেশের শাসন

ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে" এক দীর্ঘ স্মারকলিপি ১৯৩৬ সালের গোড়ায় ভারত সচিবের নিকট পাঠানো" হয়েছিলো। সেটির স্বাক্ষরকারীদের শীর্ষ নামটি ছিলো রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বড়লাটকে জানিয়ে দেয় যে, ১৯৩৫ সালের Act-এর কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই বক্তব্যের প্রতিবাদে আবার ১৯৩৬ সালের ১৫ই জুলাই কলকাতায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় ভাষণ দেন। কিন্তু, বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য হিন্দুমুসলমান মিলন আর সম্ভব হয় না।

ছয়

জাতীয় রাজনীতির অনেক ব্যাপারে তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানের কারণেই রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অনেকখানি অস্বচ্ছ, কিন্তু আন্তর্জতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, দু'একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদে (যেমন মুসোলিনীর প্রশংসা) কবির ভূমিকা উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ, সে-সব ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য অনেক স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। দুটি বিশ্বযুদ্ধই তাঁর জীবনকালে সংঘটিত হয়। যদিও হিরোসিমা-নাগাসাকির আণবিক ধ্বংসযজ্ঞ দেখবার দুর্ভাগ্য হয়নি এই শান্তিবাদী মানুষটির। ৩০-এর দশকেই বিশ্ব-পরিস্থিতি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো, তা লক্ষ্য করেছেন কবি। তাঁর অতি উদ্ধৃত পঙক্তিগুলো তার সাক্ষ্য :

> নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
> শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
> বিদায় নেবার আগে তাই
> ডাক দিয়ে যাই :
> দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
> প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। [প্রান্তিক]

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কেও প্রচুর গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। নেপাল মজুমদারের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (ছয় খণ্ড) একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্ররাজনীতি জানার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় পুস্তক। ইংরেজি-বাংলায় আরো বই অনবরতই বেরোচ্ছে। অনেক গ্রন্থে ভাবাবেগ প্রাধান্য পাচ্ছে, বিশ্রী নিন্দাও ধ্বনিত হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনে কোথাও কোথাও। এর ভেতর দিয়েই প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারা যাবে। বিশ্বশান্তি স্থাপনে তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ হয়ে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। দেশে দেশে

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্যে ইংরেজদের ভাড়াটে হিসেবে ভারতীয় সৈন্যরা কাজ করুক তা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন কবি। "ইম্পিরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহাতে খরচ জোগানো। সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া।" [সফলতার সদুপায়]

১৯২৫ সালে চীনের গণআন্দোলন দমনের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের অংশগ্রহণে নিন্দা করে 'প্রবাসী'তে ১৩৩২ সালে 'শূদ্রধর্ম' নিবন্ধে তিনি লেখেন, "চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে; সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না, কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ।.....

"চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকং কেড়ে নিতে গিয়েছিলো তখন এরাই [ভারতীয় সৈন্যরা] চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে.....।"

১৯২৭ সারের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "চীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বর্তমান অভিযান এক মানবিক অপরাধ এবং লজ্জার কথা এই যে, ভারতকে এই খেলায় খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।" এটাও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, "এই হচ্ছে ভারতের বর্তমান অসহায় দুরবস্থার ট্রাজেডী। লজ্জার কথা, আমরা যেহেতু দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ, অন্যান্য দেশের জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালানোর যন্ত্র হিসেবে তাই আমাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।" অথচ ইংরেজের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহে গান্ধী নিজে বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দেন।

জীবনের শেষ পঁচিশ বছর রবীন্দ্রনাথ শান্তিবাদী বিশ্ববুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি অবিচলভাবে তাঁদের পাশেই ছিলেন।

১৯৩৭ সালে বিনা প্ররোচনায় জাপান চীন আক্রমণ করে। চীন-জাপান যুদ্ধে কবি বিচলিত হন। সে-সময় কংগ্রেস সভাপতি নেহেরু চীনের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৩৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর China Day পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সারা ভারতে 'চীন দিবস' অত্যন্ত সফলভাবে পালিত হয়। বাংলাদেশেই এই দিন পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। বোম্বে ও কলকাতায় জাপানি কনসুলেটের সামনে জাপানি পণ্য বর্জনের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এই আন্দোলনে রোগশয্যা থেকেও কবি সমর্থন জানান। তিনি নিজে 'চীন সাহায্য সমিতি'তে পাঁচশ টাকা চাঁদা

দেন এবং ৭ই জানুয়ারি ১৯৩৮ এক বাণীতে বলেন : In the golden age of her history India sent to China her best gift, her spiritual treasure; today I appeal to my countrymen to consecrate that sacred memory and immediately offer China material help in any shape as a token of their love and do their best to alleviate the suffering that has cruelly overtaken her.

১৯৩৭-এর ১১ সেপ্টেম্বর চৈনিক জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্যে কবি বলেন : "আপনাদের মহীয়সী জন্মভূমির উপর অন্যায় ও অযৌক্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনারা যে অসীম সাহসিকতার সহিত বাধা দান করিতেছেন, আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতেছি এবং আপনাদের জয় কামনা করিতেছি।"

নানা দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। সকলের মন রক্ষা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। নেহেরুর জাপ-বিরোধী কাজ বন্ধের জন্য প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর এক চিঠির জবাবে কবি লেখেন : "আমি যে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে।...আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিকলাঙ্গ চীন হইতে যে-বুক ফাটা করুণ আর্তনাদ আসিতেছে, তাহা এমন মর্মন্তুদ ও ত্রাসজনক যে তাহা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।" এখানে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পরাজিত হয়েছেন।

শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবে আচার্যের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "আজ চীনে কত শিশু, নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত—যখন তার বর্ণনা পড়ি হৃদকম্প উপস্থিত হয়। আজ এই সংগীতমূলক শান্ত প্রভাতে আমরা যখন উৎসবে যোগ দিয়েছি, এই মুহূর্তেই চীনে কত লোকের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে—পিতার কাছ থেকে পুত্রকে, মাতার কাছ থেকে সন্তানকে, ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে, যেন মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নেই—সে কথা চিন্তা করলেও ভয় হয়। .....চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। কিন্তু আমাদের কী করবার আছে? আমরা কী করতে পারি? আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি।"

সাম্রাজ্যবাদীদের চিনতে করিব কিছু বাকি ছিলো না। জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করায় সেখানে সফরে গিয়ে একবার তিনি জাপ-সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "জাপান আসিবার সময় সমগ্র জাতি অভ্যর্থনা করিয়াছিলো।" কিন্তু বিদায়ের দিন একমাত্র হারাসান ছাড়া কেউ জাহাজঘাটে আসেনি।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও সামাজিক প্রগতির অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' ১৯৩৬ সালে। এরই শাখা 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয় ১১ই জুলাই '৩৬ কলকাতায়। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ড. পরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ। এই সংঘের সাফল্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা ছিলো। তা ছাড়া নিখিল ভারত নাগরিক অধিকার রক্ষা সংঘের (All India Civil Liberties Union) তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সভাপতি। এ সবই তাঁর প্রগতিবাদী রাজনীতিমনস্কতার পরিচায়ক।

সাত

ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলন যতোই জোরদার হচ্ছিলো ব্রিটিশ সরকার জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতা হরণের জন্য ততোই নানা কূটকৌশল প্রয়োগ করছিলো। সংবাদপত্রের ওপর সরকারের আক্রোশ ছিলো সবচেয়ে বেশি। ১৮৭৮ সালে সরকার একবার Vernacular Press Act জারি ক'রে জনমতের চাপে তা বাতিল করতে বাধ্য হয়। আবার শতাব্দীর শেষের দিকে ঐ কালাকানুন পুনঃপ্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলা সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীনতা হরণই ছিলো সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে—শুরু হয় আন্দোলন। কলকাতার 'টাউন হলে' ১৮৯৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি a grand meeting and a magnificient gathering হয়। ইংরেজি দৈনিক বেঙ্গলীর ভাষায় The Hall was crowded to suffocatlon. ডব্‌ল্য. সি. ব্যানার্জীর পৌরহিত্যে সে-ঐতিহাসিক সমাবেশে 'সিডিশন বিল'-এর বিরুদ্ধে অন্যান্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ভাষণ দেন। তাঁর সেই 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক ভাষণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে বাংলা ভাষায় রচিত এক অসামান্য দলিল, যে-দলিলে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। 'কণ্ঠরোধ' ১৩০৫ সনের বৈশাখে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। শ্লেষমিশ্রিত স্বভাবসুলভ ভাষায় কবি বলেছিলেন—

"অদ্য আমি যে-ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা, তথাপি সে ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

"কারণ যাহাই হউক-না কেন, যে ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না এবং যে ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে-ভাষায় তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা, আমরা কোন্ ভাব হইতে উদ্ভাসিত না দুর্বিষহ স্পর্ধা হইতে উদ্‌গীরিত, তাহার বিচারের ভাষা তাঁহাদের হস্তে এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

"আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি, উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই। কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষায় ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাঁটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না এবং ঠিক কোন কোন খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটেও অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কা-বেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায় সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উলকাপাতের ন্যায় অযথাস্থানে দুর্বল জীবের আন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমন স্থলে সর্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্য ক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই-একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে।.....

"ইতিমধ্যে সেদিন দেখিলাম, গভর্ণমেন্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহ শৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ্ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ-প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!"

অর্থাৎ প্রচলিত দণ্ডবিধিও পর্যাপ্ত নয় বাংলা পত্রপত্রিকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাই সরকার স্বতন্ত্র কালাকানুনের দ্বারা সংবাদপত্রকে শৃঙ্খলিত করার যে উদ্যোগ নেয় তাতে কবির মনে ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। বাক্‌স্বাধীনতাহরণকারী ও নিবর্তনমূলক 'সিডিশন বিল'-এর প্রতিবাদে তিনি বলেন :

"....হে রাজন্ আমাদিগকে আরো কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ। যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরো পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন। যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি, তাহা রোধ করিয়া ফল কী?

"সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষর লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে। সর্পের অতি গোপন এবং দংশন, নিঃশব্দ সেই জন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে। সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে, দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কোনো ঘনান্ধকার আমাবস্যা রাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে তবে সিংহদ্বারের কুকুর না ডাকিতেও পারে, রাজপ্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গে কঙ্কনকিঙ্কিনী পুরকেয়ুর তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু না কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না।"

"...রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা। তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে।....."

কবি স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন,

"আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোনো অধিকার নাই। আমরা যাহা মনুষ্যমাত্রেরই পাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মানুষ্যোচিত গর্ভানুভব করিবার কোনো কারণ নাই।....

"এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।"

যেখানে যখনই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার লজ্ঘিত হয়েছে, অবগত হওয়া মাত্রই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে কবির কণ্ঠে।

১৯৩১-এর ৩০ আগস্ট চট্টগ্রামে এক তরুণ বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের গুলিতে একজন পুলিশ অফিসার নিহত হয় এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দি শিবিরে রক্ষীদের গুলিতে দু'জন রাজবন্দি নিহত ও অনেকে আহত হন। এই ঘটনায় ব্যাপক দাঙ্গা বেধে যায়। তার প্রতিবাদে এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, "আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে।" [হিজলী ও চট্টগ্রাম/কালান্তর।] রাষ্ট্রনেতা না হয়েও রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবমতো প্রতিবাদ করেছেন। তবে তাঁর চিন্তাধারায় বিশেষ করে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সাধারণ পাঠক অল্পই সিক্ত হয়েছে, এর কারণ তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে অলংকৃত ও

শিল্পিত ভাষায় — সরাসরি নয়, সকল সময়। তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ-বক্তৃতায় উপমা-মেটাফরের ছড়াছড়ি এত বেশি যা বুদ্ধিদীপ্ত পাঠককে নাড়া দিলেও সাধারণ পাঠকের কাছে রয়ে গেছে অস্পষ্ট ও ঘোলাটে। এটা তাঁর সীমাবদ্ধতা নয়, দোষ নয়; দোষ তাঁর দেশবাসীর যাদের অধিকাংশের চেতনার মান অতি নিচে। সেজন্যেই বোধ হয় তিনি বারবার ব্যক্তির আত্ম-উন্নতির ওপর জোর দিয়েছেন। তা ছাড়া কোনো কিছু উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া তাঁর মনঃপুত হতো না। দেশপ্রেম, স্বাবলম্বিতা নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে আসুক সেটাই ছিলো তাঁর কাম্য। এ জন্যে তিনিই নিজেই চলে গেছেন তৃণমূল পর্যন্ত সংস্কারের জন্য।

পরাধীন দেশের রাজনীতির লাগাম টেনে ধরে তার গতি নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। জাতীয় স্বাধীনতাও স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য তাঁর আগ্রহে কোনো খাদ নেই কিন্তু তাঁর ভূমিকাটি অনেকটা passive— অপ্রতিরোধী। অথচ সমাজের উন্নতির জন্য তাঁর প্রবাস অবিশ্বাস্যরকম আন্তরিক। তিনি যেমন পলায়নবাদী ছিলেন না তেমনি প্রতিবাদী হয়েও প্রতিরোধী ছিলেন না। তাঁর পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি ইত্যাদি তাঁকে বাধা দিয়েছে উগ্র প্রতিবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে। তা সত্ত্বেও জাতীয় রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান অনেক বিখ্যাত সার্বক্ষণিক রাজনীতিকের চেয়ে তার পরিমাণ অধিক।

বিশ ও তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রান্তরে যে-ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে, যখন অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারে দিক্‌দিগন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন, রবীন্দ্রনাথেরও তখন বেলা শেষ। চারদিকের পরিস্থিতি দেখে কোমল-হৃদয় কবি ঘোষণা করেন :

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,

[প্রশ্ন]

জীবনের শেষ বছরগুলোয় এমন সব রাজনৈতিক ঘটনাবলির মুখোমুখি হতে হয়েছে দেশবাসীর সঙ্গে কবিকেও যে তাঁর পক্ষে নিশ্চুপ থাকা সম্ভব হয়নি, উপযুক্ত উপায়েই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৩৭ সালের ২৪শে জুলাই আন্দামানের নির্বাসিত রাজবন্দিগণ চার-দফা দাবি পূরণের জন্য অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। তাঁদের অন্যতম দাবি ছিলো আন্দামান থেকে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা। মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দিদের অনশনের কথা প্রথমে সরকার গোপন রাখে; কিন্তু তারপর বাধ্য হয়ে একটি প্রেসনোটের মাধ্যমে সংবাদটি প্রকাশ করে। ১৯৩৭-এর ২ আগস্ট অনশনরত বন্দিদের দাবির সমর্থনে কলকাতা টাউন

হলে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ভাষণ দেন। তিনি বলেন,

"আপনারা সকলেই জানেন আমি রাজনীতিক নই।.....আজিকার সন্ধ্যায় আমি ন্যায়বিচার ও মানবতার আহ্বানে সাড়া দিতেছি। এই আহ্বান উপেক্ষা করিলে বিপদ অনিবার্য।

"এক সপ্তাহের অধিক হইল আন্দামানে দুই শতাধিক রাজনৈতিক বন্দী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনশনের সংবাদ প্রথমত চাপা দেওয়া হইয়াছিল। দেশবাসীর হৃদয়বৃত্তির প্রতি এই হৃদয়হীন উপেক্ষা আমাদের জাতীয় অসহায় অবস্থাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংল্যান্ড বা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশের গভর্নমেন্টই এই অনশনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এতদিন গোপন রাখিতে সাহস পাইতেন না।

"রাজনৈতিক বন্দীরা দাবি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবি ন্যায্য এবং সামান্য। এই দেশে গভর্নমেন্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন; সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে সহস্র মাইল দূরবর্তী এক দ্বীপে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত যে-ব্যবহার করা হয়, সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে এবং তাঁহারা রাজনৈতিক বন্দীদের ভারতবর্ষে রাখিবার দাবি করিতে পারে। তাঁহারা দেশে থাকিলে জনমত ভারতীয় কারাজীবনের তীব্র ক্লেশ অন্তত কিয়দংশে হ্রাস করিতে পারে।...শাসনতন্ত্রের হৃদয়হীন অনমনীয়তার নিকট উহার ন্যায়বোধ ও কারুণ্যধর্ম আর একবার পরাজয় মানিল।

"ভারতবর্ষের যে-সকল প্রদেশে গণপ্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাসংকোচক সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

"শুধু বাংলাদেশেই শত শত যুবক এখনো বিনা বিচারে আবদ্ধ আছে; বাংলাদেশে প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোনই তোয়াক্কা রাখেন না; বাংলায় ব্যক্তিস্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক।

"বাংলা গভর্নমেন্টের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁহারাও বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেন্টের ন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া উদারতা ও সহানুভূতির সহিত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে বিবেচনা করুন।

"....এই প্রদেশের তরুণ-তরুণীরা অনির্দিষ্টকাল বিনা বিচারে আবদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। আইনের যে আমূল পরিবর্তন করা আবশ্যক, তাহা সত্য; কিন্তু আজ আমার দেশবাসী আমাকে যে

তাঁহাদের সহিত আইনের আমূল পরিবর্তনের দাবি করিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা নহে, উহার কঠোরতা হ্রাসের দাবি করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন।"[১৭]

দেশের ও অন্যান্য দেশের মনুষ্যরূপী জন্তুর নৃশংস তৎপরতায় ক্ষুব্ধ কবি লিখলেন :

আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তাঁরা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি।

[জন্মাদিন/সেঁজুতি]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে মোহিতলাল মজুমদার 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "বর্তমান বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব ব্যাপক হইলেও তাহা যে তেমন গভীর হইতে পারে নাই ইহার কারণ আপাতত এই বলিয়া মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সে-সাধনার শক্তি আমাদের ছিল না—অতিশয় সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, এই নিতান্ত নিম্নভূমি তলে দাঁড়াইয়া আমরা সেই গগনবিহারী গরুড়ের পক্ষ ও বক্ষবল আয়ত্ত করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ, এই ভূমিতলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আমাদের মানস-নেত্রের পরিবর্তন করাইয়া ভিতর হইতেই যে মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন, তাহাতে এককালে মনে হইয়াছিল, এ সাধনায় আমরা অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। কিন্তু তাহা হয় নাই।"[১৮]

আজ প্রায় ষাট বছর পরেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুবই ব্যাপক কিন্তু গভীর নয়। সত্যিই যেন বাঙালি তাঁর প্রিয় কবি ও চিন্তাবিদকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যা তাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা গভীরভাবে অধীত ও আলোচিত হলে বহু সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে পূজা করতে আগ্রহ আছে এদেশের অনেকের কিন্তু তাঁর সাহিত্য পড়তে আগ্রহ নেই কারো খুব একটা। তাঁর গান শুনতে ভালো লাগে অনেকের কিন্তু তাঁর চিন্তাধারায় সিক্ত হতে নয়। বাঙালি সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা আজ ভক্তিবাদী ও বিরুদ্ধবাদীদের পূজা ও অবহেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছেন। এ প্রবণতা গোটা জাতির জন্য অকল্যাণকর।

সূত্রনির্দেশ

১. 'কবিতা', সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু, আষাঢ় ১৩৪৮, কলকাতা

২. কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ৩৩৮

৩. সুভাষচন্দ্র, (প্রথম খণ্ড), পরিমল কুমার ঘোষ, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১৯৮

৪. Advent of Independence, A. K. Majumder, Calcutta, p. 33

৫. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অরবিন্দ পোদ্দার, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১০৩-১০৫

৬. রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ, পৃ. ২

৭. রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭৪, পৃ. ১০৯

৮. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃ. ১৮৬

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

১০. রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, চিন্মোহন সেহানবীশ, বিশ্বভারতী কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. -১৩৫

১১. জেল থেকে জেলে, জিতেন ঘোষ, ঢাকা, পৃ. ২৪১

১২. রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, পৃ. ১৩৬

১৩. বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, ড. নাজমা জেসমীন চৌধুরী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৮২

১৪. রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, পৃ. ১৭৫

১৫. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃ. ১৯৬। মহাত্মা-২, ডি. জি. টেণ্ডুলকার, পৃ. ৭২। পট্টভি সীতারামাইয়া, হিস্টরি অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস—১, পৃ. ২২৮

১৬. সুভাষচন্দ্র (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১০৬

১৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ আগস্ট ১৯৩৭/১৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

১৮. আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মোহিতলাল মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স লি, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ. ১৫৩